শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

১৭ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৭ জুলাই ২০১৯ ০৯:১৪

advertisement

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষা পদ্ধতির সঠিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল আছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়টি বারবার উচ্চারিত হলেও এটি নিয়ে গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা নেই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। উভয়ের ক্ষেত্রেই নৈতিকতার বিষয়টি প্রযোজ্য। তবে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার বিষয়টি সম্পর্কে জানবে ও তাদের জীবনে এর বাস্তবায়ন ঘটাবে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক সম্পর্ক থাকতে হবে।' এই মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। কীভাবে এই সম্পর্ককে মানবিক সম্পর্কে রূপান্তরিত করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীকে গতানুগতিক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করবেন না। বরং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার বাইরে মানবিক শিক্ষার যে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে সেই বিষয়গুলোও শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাদান করাই শিক্ষকের মূল কাজ নয়। বরং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন ও বহুমাত্রিক চিন্তাধারার উদ্ভাবন ও বিকাশ ঘটাতে পারছে কিনা সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিক্ষকদের আচরণ, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা, শিক্ষাদানের স্বকীয়তা, ইতিবাচক দর্শন এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে। শিক্ষকরা যখন শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে না ভেবে রোবট হিসেবে চিন্তা করবে তখন শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ঘটবে না। বরং শিক্ষা শিক্ষার্থীর ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। যার প্রভাব তার সামগ্রিক জীবনাচরণকে প্রভাবিত করে। আমরা কেমন শিক্ষক চাই।

আমরা এমন একজন শিক্ষক চাই যার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক গুণাবলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। একজন শিক্ষার্থীকে আমরা একটি গাছের বীজের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই বীজটিকে কীভাবে মাটিতে রোপণ করতে হবে, কীভাবে এটিকে ক্রমান্বয়ে নিবিড়ভাবে যতœ করে বৃক্ষে পরিণত করতে হবে তার দায়িত্ব শিক্ষকদের নিতে হবে। এখানে বৃক্ষ হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর প্রতিরূপ। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই ব্যবধান কেবল মনের নয়, এই ব্যবধান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের তাদের প্রতিপক্ষ ভাবছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের তাদের প্রতিপক্ষ ভাবছে। সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে কর্মরত একজন প্রবীণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মিথ্যা অভিযোগ এনে কতিপয় শিক্ষার্থী তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রকৃত বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই প্রবীণ শিক্ষক এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এটিকে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটিকে কতিপয় শিক্ষার্থী ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ এই ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করলে শিক্ষা বাণিজ্যের জায়গাটি বাধাগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া যে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া ছাড়াই সার্টিফিকেট নিতে চায় তাদেরও উদ্দেশ্য সফল হবে না। কেন এমনটি ঘটল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এখানে কতিপয় শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ইঙ্গিত করছে, পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য শক্তি হিসেবে স্বার্থপর ও লোভী শিক্ষকরাই এই কাজটিতে ইন্ধন দিয়েছেন। এটি কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয় বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিছু শিক্ষক বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সাময়িকভাবে এ ধরনের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নিজেদের গর্বিত ও বিজয়ী ভাবলেও যে শিক্ষার্থীদের তারা ব্যবহার করেছে সেই শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকরা শ্রদ্ধাবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। শিক্ষককে তখন তারা শিক্ষক না ভেবে দুর্বৃত্ত হিসেবে বিবেচনা করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু শিক্ষকের যৌন নিপীড়নে সংশ্লিষ্ট থাকার খবর আসছে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার পবিত্র জায়গা থেকে সরে গিয়ে অনেক অভিভাবকের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের পরস্পরের সঙ্গে দলাদলি, দুর্নীতি ও অবৈধ কাজে সম্পৃক্ততার নেতিবাচক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব বাড়ছে। একটা সময় যে মানের শিক্ষক আমরা পেয়েছিলাম এখন সে মানের শিক্ষক আমরা পাচ্ছি না। এর কারণ হিসেবে সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়কে দায়ী করা যায়। একটা সমাজে যখন পচন ধরে তখন তা সবস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের শিক্ষক। যেই শিক্ষকদের প্রভাবে তাদের শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে উঠছে তাদের অনৈতিক আচরণ নতুন শিক্ষকদের ওপর পড়ছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা আর আগের মতো মহান ও উদার শিক্ষকদের পাচ্ছি না। প্রসঙ্গক্রমে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের দৃষ্টান্ত এখানে আনা যেতে পারে। তিনি কেবল বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন মহান শিক্ষক। শিক্ষকতা পেশাকে অন্তরে ধারণ করে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রাণের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষাদান ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎকে প্রভাবিত করার মহান ব্রত নিয়ে সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্যে থাকার জন্য তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। কলকাতার বাংলা কলেজে একটি কক্ষে বসে তিনি প্রতিদিন ১৫-২০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে গবেষণার কাজ পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে করে গেছেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, শিক্ষার্থীদের নিয়ে গবেষণা করার সময় তিনি একজন শিক্ষার্থীর বুকে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন। শিক্ষককে তার শিক্ষা উপাদান শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দময় করে তুলতে হবে। র

বীন্দ্রনাথ তার শিক্ষা ভাবনা থেকে বলেছেন, ‘যে শিক্ষায় আনন্দ নেই সেই শিক্ষা মূল্যহীন।’ ইতিহাস থেকে আমরা জানি সক্রেটিস ছিলেন প্লেটোর শিক্ষক, প্লেটো ছিলেন অ্যারিস্টটলের শিক্ষক, অ্যারিস্টটল ছিলেন আলেকজ্যান্ডারের শিক্ষক। তাদের পারস্পরিক জ্ঞানের বহুমাত্রিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষা থেকে উদ্ভূত নতুন জ্ঞান সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এমন বহুমাত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শিক্ষকদের আজ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষক হিসেবে সক্রেটিসের জীবনাচরণকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তার সৃষ্টিশীল কথাবার্তা ও বিনীত আচরণ মানুষকে তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তার জ্ঞানের গভীরতার প্রকাশ যখন তিনি ঘটাতেন তখন শিক্ষার্থীসহ সমাজের মানুষরা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। অনেকেই বলে থাকেন তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করতেন না। বরং উদার প্রকৃতি, খোলা মাঠ, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ছিল তার শিক্ষায়তন। তিনি নিজেকে শিক্ষা ও দর্শনের সঙ্গে এতটাই সম্পৃক্ত করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিল। এর

ফলে তার কাছে সংসার ও জীবিকার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছিল। শিক্ষার জন্য তার এই মহান আত্মত্যাগের ফলে তার পরিবারকে দু'মুঠো খাবারের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি যেতেন। তাদের খোঁজখবর নিতেন। শিষ্যদের বাড়িতে বসেই খাওয়া-দাওয়া করতেন।

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া একজন মহান শিক্ষক ছিলেন। নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি নারী শিক্ষার্থীদের বের করে এনেছেন। তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। শিক্ষার অধিকার যে কেবল পুরুষের নয়, নারীরও সেটি তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এমন শিক্ষকই আমাদের দরকার। প্রতিটি শিক্ষককে হতে হবে দার্শনিকের মতো। তিনি শিক্ষার্থীর মনের ভেতরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বের করে এনে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে নিজেকে নিবেদিত করবেন। শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা এত বেশি হবে যে, তা শিক্ষার্থীর চিন্তার জগৎকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করে পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেবে। শিক্ষকদের যে শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে সেখানেও এক ধরনের শৈথল্য দেখা দিচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

একজন শিক্ষক যদি একজন ভালো মনের মানুষ হতে পারেন তবেই তিনি ভালো শিক্ষক হতে পারেন। এই ভালো মন থেকে সৃষ্টিশীল ও উদার চিন্তাধারা বের হয়ে এসে শিক্ষার্থীর মননকে এমনভাবে প্রভাবিত করবে যে, শিক্ষার্থীও একজন ভালো মনের সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কৃত্রিম প্রাচীর ও রক্ষণশীলতা ভেঙে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠুক। রাষ্ট্রের উন্নয়নে এটিই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। য় ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী : শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক